প্রারম্ভিক কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

মুসলিম নওজোয়ানরা কোথাও কোথাও জিহাদের নামে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার স্বপ্ন দেখছেন। ইসলামের বড় বড় উলামাগণ যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এই জিহাদী চিন্তাধারা তখনই বাস্তবায়ন হয়, যখন প্রথমতঃ কোন মুসলিম রাষ্ট্রনেতাকে 'কাফের' ফতোয়া দেওয়া হয়। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা জানেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ, বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের প্রশস্ততায় থাকে; যতক্ষণ না সে কোন অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত হয়।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেছেন, "যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে।" সাহাবী বললেন, 'হে আল্লাহ রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি?' তিনি বললেন, "সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং কাউকে 'কাফের' না বানানো পর্যন্ত তাকে খুন করা হচ্ছে না। আর তার জন্যই তাঁদের নিকট থেকে যাকে-তাকে 'কাফের' বলতে শোনা যায়। অথচ বিষয়টি বড় আত্মবিধ্বংসী।

এ ব্যাপারে আমার 'যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান' পুস্তকে অনেক কিছু লিখেছি এবং বলেছি যে, এই শ্রেণীর তৎপরতায় লাভ হয় দুশমনদেরই। তাতে 'জলের ছিটে দিয়ে লগীর গুঁতো খাওয়া' হয় এবং বদনাম হয় মুসলিমরা।

বড় বড় উলামায়ে কিরাম এই সর্বনাশিতার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বিভিন্ন বই-পুস্তক প্রকাশ করেন। তার মধ্যে শায়খ আব্দুল লাতীফ বিন আব্দুর রহমান আ-লে শায়খের 'উসূলুত তাকফীর' এবং শায়খ মুরাদ শুক্রীর 'ইহকামুত তাক্বরীর, লিআহকামি মাসআলাতিত তাকফীর' বই দু'টি অন্যতম। এ ছাড়া শায়খ ইবনে বায, শায়খ ইবনে উসাইমীন (রঃ) প্রমুখ উলামাগণের ফতোয়া উদ্ধৃত ক'রে এই পুস্তিকা আমি আমাদের যুবকদলকে উপহার দিতে প্রয়াস পাই।

আমার বড় আশা এই যে, বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটি আমার যুবক ভাইদের দ্বীনী স্পৃহা ও আবেগের গাড়ির ব্রেক স্বরূপ কাজে দেবে -- ইন শাআল্লাহ।

আল্লাহ সকলকে সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করুন। আমীন।

বিনীত
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
রবিউল আউয়াল ১৪১৪হিঃ

এক মালিক তার চাকরকে ঠিকমত খেতে দেয় না, ডিউটির বাইরে কাজ নেয়, কাজে কোন ত্রুটি হলে মারধর করে, ঠিকমত বেতন দেয় না। এ মালিককে কি 'কাফের' বলবেন?

একজন চার মযহাবের কোন এক মযহাবের তকলীদ করে না। সে কি 'কাফের'?

এক রাজা ইসলামী সংবিধান অনুসারে দেশ শাসন করে না। তাকে কি 'কাফের' বলা যাবে?

কোন মুসলিমকে কোন ইসলাম-বিরোধী কথা বলতে শুনে বা কাজ করতে দেখে তাকে 'কাফের' বলা কোন সাধারণ গালি বা সাধারণ সহজ ব্যাপার নয়। মুসলিমের কোন পাপ দেখে তাকে কুফ্‌রের প্রতি সম্বন্ধ করা বড় বিপজ্জনক। আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে বলে এ 'কাফের' এবং সে যদি প্রকৃতপক্ষে কাফের না হয়, তাহলে সে কথা তার নিজের উপর বর্তায়।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলা তাকে হত্যা করার সমান।" *(বুখারী, মুসলিম)*

আন্দাজে-অনুমানে কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলা অতি বড় গোনাহর কাজ। যা এক প্রকার অনুমানে মিথ্যা বলা ও অপবাদ দেওয়ার শামিল। আর মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (١١٦)

অর্থাৎ, তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবার জন্য তোমরা বলো না, 'এটা হালাল এবং এটা হারাম।' যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। *(সূরা*

নাহল ১১৬ আয়াত)

{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (٣٠) سورة الحـــج

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা দূরে থাক মূর্তিরূপ অপবিত্রতা হতে এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

{وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًـــا وَإِثْمًا مُّبِينًا} (٥٨) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত)*

সুতরাং কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে 'কাফের' বলে ফতোয়া দেওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান এবং কিতাব ও সুন্নাহকে শুদ্ধ ও সঠিকভাবে উপলব্ধিকারী আলেম, এ কাজ কেবল তাঁদেরই।

পক্ষান্তরে কাউকে 'কাফের' বলে ফতোয়া দেওয়ার কিছু মৌলিক নীতিও আছে, যা না জানলে কারো পক্ষে এই মাসআলায় মুখ খোলা আদৌ বৈধ নয়। কারণ আম-খাস, নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট এবং আরবী বাক্-প্রণালী না জানলে বাক্যের উদ্দেশ্য স্থিরীকরণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। ধর্মীয় অনুদেশ বুঝতে ত্রুটি ও জটিলতা দেখা দিতে পারে। যাতে মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হতে পারে এবং ধর্মীয় বিধান ব্যাখ্যায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

যুল্ম (অত্যাচার বা সীমালংঘন) গোনাহ বা পাপ (অবাধ্যতা), ফিস্ক (ফাসেকী, আনুগত্যহীনতা), ফুজুর (ফাজেরী, দুষ্কৃতি), অলা' (বন্ধুত্ব করা), বারা' (শত্রু জানা), রুকূন (কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া বা আকৃষ্ট হওয়া), শির্ক (অংশী স্থাপন করা) ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের কখনো তার সাধারণ অভিহিতার্থ উদ্দেশ্য হয় আবার কখনো বা তার প্রকৃতার্থ ও লক্ষ্যার্থ উদ্দেশ্য হয়। বাচ্য নিরূপণ করার জন্য শব্দগত বা অর্থগত কোন ইঙ্গিত বা আভাস থাকা জরুরী।

অবশ্য তা সুন্নাহর ব্যাখ্যায় ও নববী বিবরণে সহসায় উপলব্ধি করা সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَـــن يَـــشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (٤) سورة إبراهيم

আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা ইব্রাহীম ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٤٤) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশ সহ পুরুষ (মানুষই) প্রেরণ করেছিলাম। তোমরা যদি না জান, তাহলে ঐশীগ্রন্থধারীদের জিজ্ঞাসা কর। (আমি প্রেরিত পুরুষদেরকে পাঠিয়েছিলাম) স্পষ্ট নিদর্শন ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ। তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি মানুষের নিকট যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাবার জন্য, যাতে ওরা চিন্তা-গবেষণা করে। *(সূরা নাহল ৪৩-৪৪ আয়াত)*

অনুরূপভাবে মু'মিন, মুত্তাক্বী, পরহেযগার, সৎকর্মশীল, অনুগত, প্রভৃতি পরিভাষায় উদ্দেশ্য সাধারণ স্থানে প্রশংসার ক্ষেত্রে যা হয়, আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার ভিন্ন হয়। যেমন ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ী প্রভৃতিকে আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে মু'মিন (বিশ্বাসী) বলে সম্বোধন করা হয়। তারা ঈমানের সাধারণ অর্থের পর্যায়ভুক্ত। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

"হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত

করবে........।” *(সূরা মাইদাহ ৬ আয়াত)*

“হে ঈমানদারগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না......।” *(সূরা আহযাব ৬৯ আয়াত)*

“হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুসময় উপস্থিত হয়, তখন অসিয়ৎ করার সময় তোমাদের মধ্যে হতে দু’জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে.....।” *(সূরা মাইদাহ ১০৬)*

সুতরাং এই ধরনের আয়াতে ঐ পাপীদেরকেও ‘ঈমানদার’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তাদের বুকে বিশ্বাস আছে, কিন্তু তারা পূর্ণ মু’মিন নয়। তাই তারাও বিভিন্ন অনুশাসন পালনে আদিষ্ট।

পক্ষান্তরে ঈমানদার মুমিনের যখন প্রশংসা করা হবে, তখন কিন্তু তারা উদ্দিষ্ট হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

“তারাই মু’মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।” *(সূরা হুজুরাত ১৫ আয়াত)*

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকটে সিদ্দীক (যে সত্যকে সদা সত্য জানে এবং যার কাজ তার কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করে) ও শহীদ।” *(সূরা হাদীদ ১৯ আয়াত)*

অতএব এ মু’মিনগণ খাঁটি ও পূর্ণ ঈমানের মু’মিন। গুনাহগাররা এতে পরিগণিত নয়। তবে তারাও অসম্পূর্ণ ঈমানের মু’মিন। তাইতো সলফগণ বলেন, ‘পাপী অন্তর বিশ্বাসের কারণে মু’মিন এবং পাপের কারণে ফাসেক।’ অর্থাৎ, ফাসেক ঈমান থেকে খারিজ নয়।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে “ব্যভিচারী মু’মিন থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করে না, মদ্যপায়ী মু’মিন থাকা অবস্থায় মদ পান করে না, কোন লুণ্ঠনকারী মু’মিন থাকা অবস্থায় লুণ্ঠন করে না।” *(বুখারী, মুসলিম ৫৭নং)* এবং “সে মু’মিন নয়, যার কষ্টদান থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না। *(বুখারী, মুসলিম)*

কিন্তু এই ধরনের হাদীসে ‘মু’মিন নয়’ কথার অর্থ এ নয় যে, সে

‘কাফের’। বরং সে মু’মিন বলেও অভিহিত থাকবে এবং সেই ব্যক্তির মত হবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস করে না। এই কথাই সলফরা বুঝেছেন এবং খাওয়ারেজ, মুর্জিয়া প্রভৃতি প্রবৃত্তিপূজারী বিদআতী দলের খণ্ডনে এই অভিমতকেই সুসাব্যস্ত করেছেন। অতএব উলামাগণের উচিত, এই কথাটিকে ভালভাবে উপলব্ধি করা। কারণ, তাতে অনেকের বুদ্ধিভ্রম ও পদস্খলন ঘটে থাকে।

এ কথাও স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে, কোন কাবীরাহ গুনাহর উপর পারলৌকিক তিরস্কার ও শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের উপর আরোপ করা যাবে না। অর্থাৎ, যেমন আমভাবে বলা যাবে, “যে ব্যক্তি প্রাণ হত্যা করবে, সে জাহান্নামবাসী হবে।” কিন্তু এ কথা খাসভাবে বলা যাবে না যে, “অমুক প্রাণ হত্যা করেছে, অতএব সে জাহান্নামবাসী হবে।” যেহেতু ঐ নির্ধারিত শাস্তিতে কোন প্রতিবন্ধক থাকতে পারে; যেমন ঐ ব্যক্তির আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি মহব্বত, তাঁর পথে জিহাদ, অন্যান্য নেকীর আধিক্য, তার উপর আল্লাহর অসীম দয়া ও ক্ষমা, মু’মিনদের শাফাআত এবং ত্রিজীবনে (দুনিয়া, কবর ও কিয়ামতে) বিভিন্ন আপদ-বিপদ থাকার ফলে তার ঐ পাপ ক্ষমার্হ হতে পারে। যার জন্যই সলফগণ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য, সে ‘জান্নাতী’ অথবা ‘জাহান্নামী’ বলে সাক্ষ্য দেননি; যদিও বা সে ব্যক্তির আমলের উপর শরীয়তের এমন কোন সিদ্ধান্তমূলক বাণী থাকে, যাতে মনে হয়, সে ‘জান্নাতী’ অথবা ‘জাহান্নামী’। তাঁরা আমভাবে ঐ ধমক ও শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত শুনিয়ে থাকেন, যেমন আমভাবে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁরা আম ও খাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেন।

আব্দুল্লাহ বিন হিমার নামে এক ব্যক্তি মদ পান করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাকে ধরে আনা হল। লোকটিকে দেখে এক ব্যক্তি অভিশাপ করল ও বলল, ‘কত বার একে রসূল ﷺ-এর নিকট ধরে আনা হয়!’ তা শুনে নবী ﷺ সেই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বললেন, “ওকে অভিশাপ করো না।

ও আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে।” *(বুখারী, মিশকাত ৩৬২৫নং)* অথচ তিনি মদ পানকারী ও তার বিক্রেতা, প্রস্তুতকারক, বহনকারী এবং যার প্রতি বহন করা হয় তাকে অভিসম্পাত করেছেন। *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৭৭৭নং)*

সুতরাং বুঝা গেল যে, কাবীরাহ গুনাহ ক'রে ফেললে কেউ ইসলাম ও ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায় না। যেমন উক্ত লোকটি কুপ্রবৃত্তিবশে মদ পান করত ঠিকই, কিন্তু তার বুকে ছিল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান ও ভালবাসা; যদিও সে ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়।

অনুরূপভাবে হাত্বেব বিন আবী বালতাআহ একজন সাহাবী ছিলেন, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি হিজরত করেছিলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও করেছিলেন, ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বদরে শরীক ছিলেন। কিন্তু মুসলিমদের একটি গুপ্ত রহস্য মুশরিকদের নিকট প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সহচরবৃন্দ সহ গুপ্তভাবে মক্কার প্রতি যাত্রা ক'রে সেখানকার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, সে খবর একটি চিঠিতে লিখে হাওদায় আরোহিণী এক মহিলার মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এই কাজের বদলায় মুশরিকরা মক্কায় তাঁর পরিজন ও সম্পদকে নিরাপত্তা দান করবে।

কিন্তু এই গুপ্ত খবর নিয়ে ওহী অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ও যুবাইর প্রভৃতি সাহাবী (رضي الله عنهم)কে সেই মহিলার খোঁজে পাঠালেন এবং বলে দিলেন যে, তাঁরা তাকে 'রওযাহ খাক' নামক এক স্থানে পাবেন। ঠিক সেই স্থানে পৌঁছে মহিলাটিকে ধরা হল। চিঠিটি বের ক'রে দেবার জন্য বলা হলে, সে অস্বীকার করল। কিন্তু খুব ধমক ও ভয় প্রদর্শনের পর তার চুলের খোঁপা থেকে চিঠিখানা বের ক'রে দিল এবং তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছানো হল। তিনি হাত্বেব বিন আবী বালতাআহকে ডাকলেন এবং সেই চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁকে বললেন, “এ কি হাত্বেব?” হাত্বেব বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি মু'মিন হওয়ার পর কাফের

হয়ে যাইনি এবং ইসলামকে অপছন্দ করে আমি তা করিনি। তবে আমার ইচ্ছা ছিল যে, এই অসীলায় (মক্কাবাসী কাফের) সম্প্রদায়ের নিকট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ হবে, যাতে আমার পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে।' রসূল ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “ও তোমাদেরকে সত্যই বলেছে। ওকে ছেড়ে দাও।”

যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে এটা একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা। তাই উমার رضي الله عنه নবী ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বলেছিলেন, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে ফেলি। কারণ ও কাফের হয়ে গেছে।' কিন্তু তিনি বললেন, “তুমি কি জানো যে, আল্লাহ আহলে বদরের অন্তরের গুপ্ত কথা জেনে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদেরকে মার্জনা করলাম।”

আল্লাহ পাক এ বিষয়ে সূরা মুমতাহিনার প্রারম্ভের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তিনি বললেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (١) إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} (٢) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের

জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক (তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে, সে তো সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হবে এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরা অবিশ্বাসী হয়ে যাও। *(সূরা মুমতাহিনাহ ১-২ আয়াত)*

অতএব হাত্বেব ঈমানের সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত হলেন। তাঁকে ঈমানের গুণে গুণান্বিত করা হল এবং আমভাবে ঐ আয়াতের নিষেধাজ্ঞায় তাঁকেও শামিল করা হল। যদিও তাঁর উদ্দেশ্য বিচার ক'রে তাঁর কাজের নির্দিষ্ট কারণ বর্ণিত হয়েছে।

অথচ আয়াতে কারীমায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর এ কাজ শত্রুপক্ষ কাফেরদের সাথে এক প্রকার মিত্রতা এবং তাদের প্রতি এক প্রকার সম্প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ছিল। আর এরূপ কর্মের কর্তা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত ও ভ্রষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু প্রিয় রসূল ﷺ-এর উক্তি "ও তোমাদেরকে সত্য বলেছে, ওকে ছেড়ে দাও" প্রকাশতঃ এই কথা প্রমাণ করে যে, এই কাজে কেউ কাফের হয়ে যাবে না; যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসী মু'মিন হয়, দ্বীন ও ঈমানে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় পোষণ না করে এবং তা একমাত্র কোন পার্থিব স্বার্থ লাভের খাতিরে ক'রে থাকে। এ কাজে হাত্বেব কাফের হয়ে গেলে নবী ﷺ বলতেন না যে, "ওকে ছেড়ে দাও।"

এ কথা বলাও যথার্থ নয় যে ,তাঁর উক্তি "তুমি কি জান যে, সম্ভবত আল্লাহ আহলে বদরের খবর জেনে বলেছেন, 'তোমরা যা খুশি কর, আমি তোমাদেরকে মার্জনা করলাম" তাঁকে কাফের বলার প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ, বদর যুদ্ধে মুজাহিদ সাহাবীদের সমস্ত পাপকে ক্ষমা করা হয়েছে। তাই তাঁদের কেউ কুফরী কর্ম করলেও কাফের হবেন না -- এ কথা বলা যাবে না। কারণ, হাত্বেব যদি কাফের হয়ে যেতেন, তাহলে তাঁর কোন নেকীই

অবশিষ্ট থাকত না। সুতরাং তাঁর বদর যুদ্ধে শরীক হওয়ার নেকীও ধ্বংস হয়ে যেত। কারণ, কুফরী তার পূর্বের সমস্ত নেকীকে ধ্বংস করে ফেলে। আল্লাহ পাক বলেন,

{وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٥)

অর্থাৎ, যে কেউ ঈমানের স্থলে কুফরী করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(সূরা মাইদাহ ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٨٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তারা যদি শির্ক (অংশী স্থাপন) করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যেত। *(সূরা আনআম ৮৮ আয়াত)*

সুতরাং কুফরী সকলের মতে নেকী ও ঈমানকে ধ্বংস ও নিষ্ফল ক'রে ফেলে। অতএব হাত্বেবের ক্ষেত্রে তার বিপরীত ভাবা উচিত নয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার উক্তি "তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে।" *(সূরা মাইদাহ ৫১ আয়াত)* "তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীকে ভালবাসে।" *(সূরা মুজাদিলাহ ২২ আয়াত)* "হে ঈমানদারগণ তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর; যদি তোমরা মু'মিন হও।" *(সূরা মাইদাহ ৫৭ আয়াত)* ইত্যাদি আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা সুন্নাহ দিয়েছে এবং সর্বতোভাবে সাধারণ মিত্রতা ও অন্তরঙ্গতার সাথে নির্দিষ্ট করেছে।

আর বিদিত যে, মৈত্রী ও অন্তরঙ্গতার মূল হচ্ছে ভালবাসা, সাহায্য করা এবং বন্ধুত্ব করা। এর নিম্নেও বিভিন্ন পর্যায় আছে। আর প্রত্যেক অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি ও নিন্দাবাদ আছে।

সাহাবা ও তাবেয়ীনদের অগাধ পান্ডিত্যসম্পন্ন উলামা -- যাঁরা আমাদের

সলফ -- তাঁরা এই মর্মার্থই উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালের কিছু অনারব এবং আধা আরবদের নিকটে এই সহজার্থ অপরিষ্ফুট থেকে যায়। ফলে এ বিষয়টিই তাদের নিকট তালগোল খেয়ে যায়। যাদের এ বিষয়ে জ্ঞান এবং কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যার অভিজ্ঞতা অতি অল্প। আরবী ভাষা ও শরয়ী পরিভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান না থাকার ফলে তাদের নিকট অনেক বিষয়ই প্রায় উল্টে যায়।

একদা আম্র বিন উবাইদের সাথে আম্র বিন আ'লার আহলে কাবায়েরের চিরস্থায়ী দোযখ-বাসী হওয়ার ব্যাপারে মুনাযারা (বিতর্ক) হয়। ইবনে আ'লা বলেন, 'কাবীরা গুনাহ ক'রে কেউ চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে না। বরং তাওহীদের গুণে কিছুকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ ক'রে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

কিন্তু ইবনে উবাইদ বলেন, 'না, যে কাবীরা গুনাহ করবে, সে অনন্তকাল জাহান্নামে বাস করবে।'

তিনি এর দলীলে বলেন যে, 'এটা আল্লাহর ওয়াদা এবং আল্লাহ তাঁর ওয়াদা কখনো ভঙ্গ করেন না।' এ কথা বলে কুরআন-হাদীসে যে ক'টি কাবীরাহ গোনাহর উপর চিরস্থায়ী দোযখ বাসের অয়ীদ (ধমক) এসেছে তার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

ইবনুল আ'লা তার উত্তরে বলেন, 'ভাষা জ্ঞান না থাকার ফলে তোমার মতিভ্রম ঘটেছে। এটা তো অয়ীদ, ওয়াদা নয়। অয়ীদের খেলাপ করা যায়; কিন্তু ওয়াদার খেলাপ করা যায় না।'

এইভাবে প্রবৃত্তির অনুসারী বহু মানুষের নিকট শুদ্ধ জ্ঞানই পাল্টে যায়। তাই তারা কুরআন ও হাদীস থেকে উল্টো বুঝে দলীল ধরে নিজেদের খেয়াল-খুশি মত বিশ্বাস ও বিচার ক'রে থাকে।

সুতরাং সেই মুসলিম সৌভাগ্যবান, যে কোন আহলে সুন্নাহর সাহচর্য পায়। আর সেই মুসলিম বড় দুর্ভাগ্যবান, যে কোন আহলে বিদআহ (বিদআতী আলেম)এর সঙ্গ পায়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে আশা করি বিষয়টি পরিষ্ফুটিত হয়ে উঠবে। কুরআন কারীমের কতক আয়াতকে কেন্দ্র ক'রে দুই ব্যক্তি তর্ক শুরু করল, যাদের একজন খারেজী [১] এবং অপরজন মুরজে'। [২]

খারেজী বলল, 'আল্লাহর উক্তি "আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীনদের নিকট থেকেই (আমল) কবুল করেন।" *(সূরা মাইদাহ ২৭ আয়াত)* এই কথার দলীল যে, পাপী, অবাধ্য, ফাজের ও ফাসেকদের আমল ধ্বংস, বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ, কেউ তাদেরকে আল্লাহর মুত্তাক্বী বান্দা বলতে পারে না।'

মুরজে' বলল, 'এখানে শির্কের কথা বলা হয়েছে। আর মুত্তাক্বীনের অর্থ শির্ক থেকে যারা দূরে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি শির্ক থেকে দূরে থাকবে, তার আমল কবুল করা হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, "কেউ কোন সৎকাজ করলে, সে তার দশগুণ নেকী পাবে।" *(সূরা আনআম ১৬০ আয়াত)*

খারেজী বলল, 'কিন্তু আল্লাহ তাআলার এই উক্তি "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি; সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।" *(সূরা জ্বিন ২৩ আয়াত)* তোমার ঐ কথার খন্ডন করে।'

মুরজে' বলল, 'এখানে অবাধ্যাচরণের অর্থ শির্ক করা, কাউকে আল্লাহর শরীক করা। কারণ আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর অংশী করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" *(সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)*

খারেজী বলল, 'আল্লাহর উক্তি "মু'মিন কি ফাসেকের মতই? ওরা কখনো সমান হতে পারে না।" *(সূরা সাজদাহ ১৮ আয়াত)* এবং "যারা

---

(1) *খাওয়ারেজ এক ফির্কার নাম। যাদের বিশ্বাস যে, কেউ কাবীরাহ গুনাহ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হয়।*

(2) *মুর্জিআহ এক ফির্কার নাম; যাদের বিশ্বাস এই যে, ঈমান অন্তরের প্রত্যয় এবং মুখে স্বীকার করার নাম এবং ঈমান থাকলে পাপ কোন ক্ষতি করতে পারে না।*

ফাসেক তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। যখনই ওরা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই ওদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।” *(ঐ ২০ আয়াত)* এই কথার দলীল যে, যারা ফাসেক তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামবাসী হবে।’

মুরজে’ বলল, ‘আয়াতের শেষ প্রান্তে আল্লাহর উক্তি “এবং ওদেরকে বলা হবে, যে অগ্নি শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে তা তোমরা আস্বাদন কর।” এই কথার দলীল যে, এখানে ফাসেক বলতে উদ্দেশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং জাহান্নামের শাস্তিকে মিথ্যা মনে করবে সে। কাবীরাহ গোনাহকর্তা ফাসেক তো আহলে ক্বিবলার মধ্যে গণ্য, পূর্ণ ঈমানের মু’মিন।’

এই মুনাযারাহ কোন নিম আলেম বা অনালেম শুনলে ভাববে, তাতে যথার্থ যুক্তি ও উপযুক্ত দলীল ও বলিষ্ঠ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে এবং তা নিজের মত রূপে অবলম্বন ক’রে বসবে। অথচ দু’টি মতই ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য। প্রকৃত আহলে ইল্ম ও সুপথপ্রাপ্ত কোন আলেমই তা সঠিক ধারণা করবেন না। যেহেতু সলফদের মত এই দুই মতেরই প্রতিকূল। যাঁরা কুরআনের উক্তিকে সুন্নাহর আলোকে বুঝেন ও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বিদআতীরা সুন্নাহর তোয়াক্কা না ক’রে নিজেদের মন, রায়, ইচ্ছা ও অভিরুচির মাধ্যমে কুরআনকে বুঝে ও ব্যাখ্যা করে। যার জন্য তারা সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়।[৩]

আল্লাহ তাআলার উক্তি “এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।” *(সূরা মুহাম্মাদ ২৬ আয়াত)* এই আয়াতকে ভিত্তি করে অনেকে বলেন যে, ‘কাফের ও মুশরিকদের সাথে সন্ধি ও তাদের জন্য

([3]) *মনে পড়ে, মসজিদে নববীতে এক বাংলাদেশী ভাই কুরআন পড়ছিলেন। “ইন্না ইয়া’যূযা ও মা’যূযা মুফসিদূনা ফিল আর্য......” পাশে এক মিসরী ছিলেন। তিনি প্রতিবাদ ক’রে বললেন, ‘হাযা খাত্বা, গুল, “ইন্না ইয়া’গূগা ও মা’গূগা মুফসিদূনা ফিল আর্য......” অথচ দু’জনেরই উচ্চারণ ভুল। ‘জীম’-এর উচ্চারণে ‘য’ ও ‘গ’ উভয়ই ভুল। উক্ত বিতর্কটিও অনুরূপ।*

শান্তি-প্রস্তাব বা যুদ্ধ-বিরতি প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি রক্ষা কুফরী।’ অথচ তাঁরা এর পূর্বের আয়াত লক্ষ্য করেন না, যাতে বলা হয়েছে, “যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করেছে, শয়তান তাদের কাজকে সুশোভিত করে দেখিয়েছে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে রেখেছে।” *(ঐ ২৫ আয়াত)* তাঁরা উল্লেখিত “আনুগত্য”এর মর্মার্থও বুঝেন না এবং “কোন কোন বিষয়ে”র উদ্দেশ্যেও জানেন না।

এখানে কারা কাদেরকে এ কথা বলেছিল তা জেনে ‘নির্দেশ’ স্থির করা উচিত ছিল। কিন্তু ওঁরা বাহ্যিক শব্দ ও অর্থ গ্রহণ ক’রে সর্বনামের স্থলে নাম প্রয়োগ ক’রে উক্ত ফতোয়া জারী করেছেন।

“তারা বলে” মানে কি মুসলিমরা বলে? যদি তা হয়, তাহলে ওঁদের দলীল ঠিক আছে। কিন্তু “তারা” ও “তাদেরকে” মানে যদি কাফেররা হয়, তাহলে এখান থেকে তো ঐ দলীল পাওয়ার কথা নয়।

আসলে “তারা বলে” মানে ঃ মুনাফিকরা বলে। “তাদেরকে” অর্থাৎ, মুশরিকদেরকে বলে। অথবা ইয়াহুদীদেরকে বলে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, “এটা এ জন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অপছন্দ করে তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিক বা ইয়াহুদীদেরকে) তারা (অর্থাৎ, মুনাফিকরা) বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।”

এখানে মুসলিমদের কথা বলা হয়নি। পূর্বোক্ত আয়াত তার দলীল। *(দেখুন ঃ ফাতহুল ক্বাদীর প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থ)*

পক্ষান্তরে সুন্নাহ দেখলে এ ভ্রম ভেঙ্গে যায়। হুদাইবিয়ার সন্ধি ও তার শর্তাবলীর কথা জানলে প্রকৃত সত্য স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যায়। তাছাড়া মহান আল্লাহও বলেছেন,

{وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}

অর্থাৎ, যদি তারা সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সন্ধির জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই তিনি

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা আনফাল ৬১ আয়াত)*

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} (৩৫) سورة محمد

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না; যখন তোমরাই প্রবল এবং আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। আর তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো নষ্ট করবেন না। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩৫ আয়াত)*

এ আয়াত পূর্বোক্ত আয়াতের বিরোধী নয়। যেহেতু পূর্বোক্ত আয়াত দুর্বলতা ও শেষোক্ত আয়াত প্রবলতার সাথে সম্পৃক্ত। এ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা যখন সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে শত্রুদের উপর প্রবল ও তাদের থেকে অনেক উন্নত, তখন এমতাবস্থায় কাফেরদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব ও দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। বরং কুফ্রীর উপর এমন কড়া আঘাত হান, যেন আল্লাহর দ্বীন উঁচু হয়ে যায়। প্রবল ও উন্নত থাকা অবস্থায় কুফ্রীর সাথে সন্ধিতে আসার অর্থ হবে, কুফ্রীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে আরো বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করা। আর এটা হল অতি বড় অন্যায়। তবে এর অর্থ এও নয় যে, কাফেরদের সাথে সন্ধি করার অনুমতি নেই। এর অনুমতি অবশ্যই আছে, কিন্তু সব সময় নয়। কেবল সেই সময় এর অনুমতি আছে, যখন মুসলিমরা সংখ্যায় এবং উপায়-উপকরণের দিক থেকে দুর্বল হবে। এ রকম অবস্থায় যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করাতেই লাভ বেশী। যাতে মুসলিমরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে নেবে। যেমন স্বয়ং নবী করীম ﷺ ও মক্কার কাফেরদের সাথে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ-বিরতির সন্ধি-চুক্তি করেছিলেন। *(তফসীর আহসানুল বায়ান)*

মোট কথা, উলামার উচিত, আন্দাজে বক মারতে বকরী না মেরে এ বিষয়ের মৌলিক-নীতি ও সলফগণের ইল্মী-সূত্রের অনুসরণ করা। কারণ অনুমানে বিপদ আছে, কিন্তু অনুধাবনে নিরাপত্তা আছে।

সুতরাং এ বিষয়ে মূল নীতিমালা প্রণিধান যোগ্য ঃ-

১। সুন্নাহ ও নববী হাদীসই কুরআনী আহকামের ব্যাখ্যাতা। কুরআনী আয়াতের উদ্দেশ্য মর্মার্থ ও বিভিন্ন সংজ্ঞার্থ ব্যক্তকারী। যেমন মু'মিন, কাফের, মুশরিক, মুওয়াহহিদ (তওহীদবাদী), ফাজের, ফাসেক, মুনাফিক, যালেম, মুত্তাক্বী, বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা প্রভৃতির পারিভাষিক অর্থ সুন্নাহই বর্ণনা করতে পারে।

সুন্নাহই কুরআনী বিভিন্ন নির্দেশ ও আজ্ঞার বিশদ বিবরণদাতা। যেমন কুরআন বলে, "নামায কায়েম কর।" কিন্তু তার পদ্ধতি, রাকআত সংখ্যা, সময়, আরকান, শর্তাবলী, ওয়াজেব ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ বলেনি। তা বলেছে সুন্নাহ।

যেমন কুরআন বলে, "যাকাত দাও।" কিন্তু তার পরিমাণ, নিসাব, কিসে যাকাত লাগবে, কোন্ সময় লাগবে ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা কুরআন দেয়নি। সুন্নাহ তা দিয়েছে।

তদনুরূপ রোযা, হজ্জ ইত্যাদির আহকাম এবং বিভিন্ন হারাম ও হালালের তাফসীর সুন্নাহ দিয়েছে।

যে সব বিবরণ বিশ্বস্ত-সূত্রে শুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে, তাই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হবে। অতএব যে ব্যক্তি সহীহ সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে নিজের জন্য ইল্ম ও ঈমানের প্রবেশ-দ্বার বন্ধ করবে এবং কুরআনী খনির বহু অমূল্য মণি-মুক্তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। আবার নিজের সীমিত জ্ঞানে তার ব্যাখ্যা খুঁজতে নিজেকে তথা অপরকে ভ্রষ্ট করে বরবাদ করবে।

মোট কথা, কুরআনী রহস্য উদ্ঘাটন করতে সুন্নাহর উপকরণ জরুরী।

২। ঈমান মু'মিনের হৃদয়ে এক প্রোথিত বৃক্ষমূল। যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে। এর সবচেয়ে বড় শাখা বা কান্ড হচ্ছে, তওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদে সাক্ষ্য প্রদান, কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ') এবং সবচেয়ে ছোট প্রশাখা হচ্ছে, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা, পাথর ইত্যাদি) সরিয়ে দেওয়া।

ঈমানের ঐ শাখা-প্রশাখাসমূহের এমন শাখা (কান্ড) আছে, যা না থাকলে মূল ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রেরিত রসূল --এই সাক্ষ্য দানের শাখা। আবার এমন প্রশাখা আছে, যা না থাকলে মূল বা কান্ড বিনষ্ট হয় না। যেমন পথ থেকে কাঁটা দূর করা। আর এই দুই শাখা-প্রশাখার মাঝে আরো বহু বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আছে, যার কিছু কালেমা তাওহীদের অনুরূপ বা কাছাকাছি এবং কিছু পথ থেকে কাঁটা অপসরণের মত বা কাছাকাছি।

সুতরাং ঈমানের এই যাবতীয় শাখা-প্রশাখাসমূহকে একাকার ও সমান ভাবা শরয়ী দলীলের প্রতিকূল এবং উম্মতের সলফ ও ইমামগণের শুদ্ধ মতের বিপরীত। তদনুরূপ কুফ্রীরও মূল এবং শাখা-প্রশাখা আছে। অতএব যেমন ঈমানের শাখা বা অংশকে ঈমান বলা হয়, তেমনি কুফ্রীর শাখাকেও কুফ্রী বলা হয়। সকল প্রকার অবাধ্যাচরণ ও পাপ কুফ্রীর শাখা-প্রশাখা, যেমন সকল আনুগত্য ও পুণ্যকর্ম ঈমানের শাখা-প্রশাখা। পরন্তু নামে ও আহকামে সবগুলি বরাবর নয়।

বলা বাহুল্য, নামায, যাকাৎ অথবা রোযা ত্যাগকারী এবং মুশরিক কিংবা কুরআন মাজীদের অবমাননাকারী, অনুরূপ মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, চোর, লুটেরা, খুনী অথবা কাফেরদের সাথে সম্প্রীতি প্রকাশকারীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নামে ও আহকামে ঈমানের শাখা-প্রশাখাগুলিকে সমাকৃতি মনে করবে অথবা নামে ও আহকামে কুফরীর শাখা-প্রশাখা সমূদয়কে একাকৃতি মনে করবে, সে কিতাব ও সুন্নাহর বিরোধী, উম্মতের সলফের মত ও পথ হতে বিচ্যুত এবং সাধারণ বিদআতী ও মনপূজারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩। ঈমান কথা ও কর্ম সমন্বিত বস্তু। আর কথা দুই প্রকারের; অন্তরের কথা, অর্থাৎ চিত্ত-বিশ্বাস এবং রসনার কথা, অর্থাৎ ইসলামের মূলমন্ত্র মুখে উচ্চারণ ও স্বীকার।

তদনুরূপ কর্মও দুই প্রকার অন্তরের কর্ম, অর্থাৎ ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প, এখতিয়ার, ভক্তি, ভালবাসা, সন্তুষ্টি, সত্যজ্ঞান প্রভৃতি। আর দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম, যেমন নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, জিহাদ প্রভৃতি বাহ্যিক কর্মসমূহ।

সুতরাং অন্তরের সত্যজ্ঞান ও প্রত্যয়ন, সন্তুষ্টি ও ভক্তি না থাকলে, ঈমান নির্মূল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দৈহিক কোন আমল যেমন নামায, যাকাৎ, রোযা, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদির কিছু ত্যাগ করলে এবং আন্তরিক প্রত্যয়ন ও বরণ বিদ্যমান থাকলে, এই স্থলে মতান্তর আছে। কালেমা ছাড়া নামায, যাকাৎ, রোযা বা হজ্জ, ইসলামের কোন রুক্ন ত্যাগ করলে ঈমান নির্মূল বা ধ্বংস হবে কি না? এবং ঐ রুক্ন ত্যাগকারীকে 'কাফের' বলা যাবে কি না? আবার নামায ও অন্যান্য রুক্নের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে কি না? অনেকের মতে নামায ত্যাগকারী কাফের।

আহলে সুন্নাহ এ বিষয়ে একমত যে, সত্যজ্ঞানের সাথে সাথে আন্তরিক কর্ম, অর্থাৎ ভক্তি ও ভালবাসা, সন্তুষ্টি ও আনুগত্য জরুরী।

মুর্জিআহ বলে, ঈমানের জন্য কেবল প্রত্যয়ন বা সত্যজ্ঞানই যথেষ্ট। কেবল অন্তরে সত্য বলে বিশ্বাস করলেই মানুষ মু'মিন হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে বিরুদ্ধাচরণ ও পাপ; যা আসলে কোন গর্হিত ও নির্দিষ্ট বা অবৈধ কাজ করা। কতক কাজ আছে যা ইসলামের ভিত্তির প্রতিকূল ও বিরোধী এবং কতক কাজ পাপ হলেও ঈমানের বুনিয়াদ ধ্বংসকারী নয়। এই দুয়ের মধ্যে সলফগণ পার্থক্য নির্ধারণ করেন। যেমন, যে কাজকে শরীয়ত কুফরী নামে অভিহিত করেছে এবং যে কাজকে কুফরী বলেনি, এই দুয়ের মাঝেও পার্থক্য সূচিত করেন।

৪। কুফরী দুই প্রকারের; কর্মগত (আমলী) কুফরী এবং অস্বীকার ও স্বেচ্ছাচারিতার কুফরী। যেমন রসূল ﷺ আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছু আনয়ন করেছেন তা জেনেশুনে অস্বীকার করা ও ঔদ্ধত্য ক'রে কুফরী

করা। আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও কর্মকে, তওহীদ ও একমাত্র তাঁর ইবাদতকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা।

এ (অস্বীকার ও স্বেচ্ছাচারিতার) কুফরী ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু আমলী কুফরী, যার কিছু ঈমানের পরিপন্থী আছে, যেমন আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা, কুরআনের অবমাননা করা, আল্লাহ বা নবীকে গালি দেওয়া ইত্যাদি।

আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ জীবন-বিধান (শরীয়ত) দ্বারা বিচার-মীমাংসা ও রাষ্ট্র-পরিচালনা না করা ও নামায ত্যাগ করা আমলী কুফরী, বিশ্বাসের বা (ই'তিক্বাদী) কুফরী নয়।

তদনুরূপ মহানবী ﷺ-এর উক্তি "আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে প্রত্যাবর্তন করো না, যাতে এক অপরের গর্দান মারতে থাক।" *(বুখারী, মুসলিম ১১৯নং)*

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট আসে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে অথবা স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে কুফরী করে।" *(বুখারী, ইবনে মাজাহ ১/২০৯)*

এগুলিও আমলী কুফরী, যা মূর্তিপূজা বা নবীকে হত্যা বা গালি দেওয়ার সমান নয়। যদিও উভয় প্রকার কর্মকেই কুফরী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি কিতাবের কিছু অংশ দ্বারা আমল করে এবং কিছু অংশ দ্বারা আমল ত্যাগ করে, তার এ কর্মকে আল্লাহ তাআলা আমল করার দরুন ঈমান এবং আমল ত্যাগ করার দরুন কুফরী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} (٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশের ব্যাপারে কুফরী কর? *(সূরা বাক্বারাহ ৮৫ আয়াত)*

অতএব আমলী ঈমানের বিপরীত আমলী কুফরী এবং ই'তিক্বাদী

ঈমানের বিপরীত ই'তিক্বাদী কুফরী।

রসূল ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সঙ্গে খুনাখুনি করা কুফরী।" *(বুখারী, মুসলিম ৬৮-নং)*

এ হাদীসে গালি দেওয়া ও খুনাখুনি করার মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একটি করলে ফাসেক্বী হয়, কুফরী হয় না এবং অপরটি করলে কুফরী (কাফেরের কাজ) হয়। আর বিদিত যে, এই কুফরী থেকে উদ্দেশ্য আমলী কুফরী ই'তিক্বাদী (বিশ্বাসগত) কুফরী নয়। এই কুফরী ইসলামের সীমারেখা থেকে কাউকে বহিষ্কার করে না। যদিও মু'মিনের বুক থেকে ঈমানের নাম এই ক্ষেত্রে বিলীন হয়ে যায়। যেমন চোর, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী ইত্যাদি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না। তবে চুরি, মদ্যপান ও ব্যভিচার করার সময় তার ঈমান হৃদয় থেকে সরে যায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে ব্যভিচার করতে পারে না। কোন চোর যখন চুরি করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে চুরি করতে পারে না এবং কোন মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে, তখন মু'মিন থাকা অবস্থায় সে মদ্যপান করতে পারে না।" *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ৫৭নং, আসহাবে সুনান)*

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ সাহাবা ﷺ থেকে গৃহীত। যাঁরা উম্মতের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ও কিতাব, সুন্নাহ, ইসলাম, কুফরী এবং তাঁর আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহে বড় অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই এই মাসআলাহ কেবল তাঁদের নিকট থেকেই গ্রহণযোগ্য হবে এবং এই সমস্যার সমাধানে কেবল তাঁদেরই সমাধান মান্য হবে।

কিন্তু পরবর্তী যুগের কিছু উলামা তাঁদের সে সমাধানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে, কিতাবের মর্মার্থ যথাযথ উপলব্ধি না ক'রে দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন।

এক দল বলে, 'কেউ কাবীরাহ গোনাহ (চুরি করা, ব্যভিচার করা, মদ পান করা, সূদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, গান বাজনা করা বা শোনা প্রভৃতি

পাপ) করলে, সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে এবং পরকালে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামবাসী হবে।'

আর অন্য দল বলে, 'কাবীরাহ গুনাহ করলেও মানুষ পূর্ণ মু'মিন থাকবে এবং পাপ তার ঈমানের কোন ক্ষতি সাধতে পারবে না।'

সুতরাং ওরা কট্টরপন্থী এবং এরা সহজপন্থী। কিন্তু আহলে সুন্নাহ আল্লাহর তওফীকে মধ্যবর্তী সঠিক পথ পান। আর সমস্ত মযহাবের মধ্যে আহলে সুন্নাহর সেই মান আছে, যে মান সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলামের আছে।

তাঁরা বলেন, 'কাবীরা গুনাহ করলে কোন মু'মিন কাফের হয়ে যায় না, যে ইসলামের গন্ডীর বহির্ভূত। বরং ঐ (যে কাজকে ইসলাম কুফরী বলেছে সেই) কাজের জন্য ঐ ব্যক্তির সাথে কুফরীর কিছু অংশ মিলিত হয়। যেমন কোন পাপী মু'মিন ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায় না, তবে তার ঈমান অবশ্যই তার পাপকর্মানুপাতে হ্রাস পেয়ে থাকে।

অতএব কুফরী, মুনাফিকী, শির্ক, যুলম প্রভৃতির ছোট-বড় পর্যায় আছে। যেমন ইবনে আব্বাস ﷺ "আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।" *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)* এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এ কুফরী সে কুফরী নয়, যা তোমরা ভাবছ।' অর্থাৎ, যে কুফরী ইসলাম থেকে খারিজ করে, সে কুফরী নয়; বরং তা ছোট কুফরী।

কুরআন নিয়ে গবেষণাকারীদের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান অনুযায়ী যে বিধান দেয় না, আল্লাহ তাকে 'কাফের' বলেছেন এবং রসূল ﷺ-এর উপর তাঁর অবতীর্ণকৃত শরীয়তকে যে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে তাকেও 'কাফের' বলেছেন। কিন্তু ও কাফের আর এ কাফের এক সমান নয়।

তিনি কাফেরকে যালেম বলেছেন,

{وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, কাফেররাই যালেম। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৪ আয়াত)*

তিনি শির্ককে যুলম বলে অভিহিত করেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

লুক্বমান ﵇ শির্ককে যুলম বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١٣) سورة لقمان

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন লুক্বমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহর কোন শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক করা তো বড় যুলম। *(সূরা লুক্বমান ১৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বিবাহ-শাদী, তালাক, রজআত, খুলআ প্রভৃতিতে সীমালংঘনকারীকে যালেম বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (١) سورة الطلاق

অর্থাৎ, হে নবী! (তোমার উম্মতকে বল,) তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং তারা নিজেও যেন বের না হয়; যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। আর যে আল্লাহর সীমা লংঘন করে, সে নিজের উপরই যুলম করে। তুমি জান না,

হয়তো আল্লাহ এর পর কোন উপায় ক'রে দিবেন। *(সূরা ত্বালাক্ব ১ আয়াত)*

ইউনুস ﷺ নিজেকে 'যালেম' বলে অভিহিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} (٨٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যুন-নূন (ইউনুস)এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গেল এবং মনে করল, আমি তার প্রতি কোন সংকীর্ণতা করব না। অতঃপর সে অনেক অন্ধকার হতে আহবান করল, তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭ আয়াত)*

আদম ﷺ আল্লাহর নিকট স্বীকার করেন যে, তিনি যুলম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

অর্থাৎ, তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি যুলম করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। *(সূরা আ'রাফ ২৩ আয়াত)*

মূসা ﷺ-ও তাঁর নিকট 'যুলম করেছি' বলে স্বীকার করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}

অর্থাৎ, সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা ক্বাস্বাস ১৬ আয়াত)*

কিন্তু এ যুলম ঐ যুলমের মত নয়।

আল্লাহ পাক কাফেরকে 'ফাসেক' বলে অভিহিত করেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ} (٢٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ মশা কিংবা তার থেকে উচ্চ (অথবা ক্ষুদ্র) পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না, সুতরাং যারা মু'মিন (বিশ্বাসী) তারা জানে যে, এ উদাহরণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য; কিন্তু যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে তারা বলে যে, 'আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন?' এতদ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন আবার বহু জনকে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তিনি সৎপথ পরিত্যাগী (ফাসেক)দের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬ আয়াত)*

তিনি অবাধ্য পাপীকে 'ফাসেক' বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٦) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন পাপাচারী (ফাসেক) তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। *(সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)*

যারা সতী নারীদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ক দেয় তাদেরকে 'ফাসেক' বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤) سورة النـــــور

অর্থাৎ, যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশি বার কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। *(সূরা নূর ৪ আয়াত)*

তিনি বলেছেন হজ্জে যৌনাচার, ফাসেকী ও ঝগড়া-বিবাদ নেই।

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (١٩٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুতরাং যে কেউ এই মাসগুলিতে হজ্জ করার সংকল্প করে, সে যেন হজ্জের সময় স্ত্রী-সহবাস (কোন প্রকার যৌনাচার), পাপ কাজ (ফাসেকী) এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত)*

কিন্তু এই ফাসেকী ঐ ফাসেকীর সমতুল নয়।

তদনুরূপ শির্কেরও দু'টি ধাপ আছে। বড় শির্ক; যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় এবং ছোট শির্ক; যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না। যেমন রিয়া (লোক প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করা)।

বড় শির্ক সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (٧٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত্ নিষিদ্ধ করবেন এবং দোযখ তার বাসস্থান হবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা মাইদাহ ৭২ আয়াত)*

আর ছোট শির্ক সম্বন্ধে বলেন,

{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (١١٠) سورة الكهف

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি তোমাদের উপর যে জিনিসের ভয় করি, তার সবচেয়ে বড় ভয় হল ছোট শির্ক।" *(মুসনাদে আহমাদ ২/৩৮)*

তদনুরূপ তাঁর উক্তি "এই উম্মতের মধ্যে শির্ক পিঁপড়ের চলন

অপেক্ষা গুপ্ত।" *(সহীহুল জামে' ৩৭৩০নং)* এগুলি ঐ বড় শির্ক নয়।

অনুরূপভাবে মুনাফিকীও দুই প্রকার। ই'তিকাদী মুনাফিকী ও আমলী মুনাফিকী। ই'তিকাদী বা বিশ্বাসগত মুনাফিকীর কথা কুরআনের বহু স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঐ মুনাফিকদের জন্য আল্লাহ তাআলা পরকালে আগুনের নিম্নস্তরে বাসস্থান নির্ধারিত করেছেন। *(সূরা নিসা ১৪৫ আয়াত)*

আমলী বা (কর্মগত) মুনাফিকী সম্বন্ধে নবী ﷺ বলেন, "চারটি আচরণ যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক হবে। আর যার মধ্যে এর একটি আচরণ পাওয়া যাবে, তা না ছাড়া পর্যন্ত তার মুনাফিকীর একটি আচরণ থেকে যাবে। কথা বললে মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করা, বাদানুবাদের সময় মুখ খিস্তি করা এবং আমানতে খিয়ানত করা।" *(বুখারী, মুসলিম ৫৮নং)*

অতএব এই মুনাফিকী ঈমান ও ইসলামের সাথে একত্রিত হতে পারে। কিন্তু তা কারো মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যেতে পারে; যদিও সে নামায-রোযা করে এবং মনে করে, সে মুসলিম। কারণ, ঈমান এই সব আচরণে বাধা দান করে। কিন্তু বিনা বাধায় ঐ আচরণ যদি কারো মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে, তাহলে সে খাঁটি মুনাফিক ছাড়া আর কি হতে পারে?

৫। কোন ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের শাখাসমূহের একটি শাখা পাওয়া গেলে জরুরী নয় যে, তাকে মু'মিন বলা হবে। যদিও তার কাজটিকে ঈমানের লক্ষণ বলা যায়। তেমনি কারো মধ্যে কুফরীর শাখাসমূহের কোন একটি শাখা পাওয়া গেলে জরুরী নয় যে, তাকে কাফের বলা যাবে। যদিও বা তার কাজটি কুফরীর এক লক্ষণ বা এক প্রকার কুফরী। যেমন কেউ কিঞ্চিৎ ইল্ম জানলে তাকে আলেম, কিঞ্চিৎ ডাক্তারী জানলে ডাক্তার, কিঞ্চিৎ ফিক্হ জানলে ফকীহ, কিঞ্চিৎ লিখতে জানলে লেখক, কিঞ্চিৎ সিলাই করতে জানলে দর্জি বলা যায় না।

কিন্তু কুফরীর ঐ শাখাকে কুফরী (বা কাফেরের কাজ) বলা যাবে। যেমন

হাদীসে বলা হয়েছে, “আমার উম্মতের মধ্যে দুটি কর্ম যার দ্বারা কুফরী হয়; বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃতের উপর শোকজারী করা।” *(মুসলিম ৬৭নং)* “যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে শপথ করে সে কুফরী করে।” *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬২০৪নং)* কিন্তু সাধারণভাবে ঐ কর্মের কর্তাকে ‘কাফের’ বলে অভিহিত করা যাবে না।

যে ব্যক্তি এ বিষয়টি বুঝতে পারবে, সে সলফের ফিক্হ, ইলমের গভীরতা ও দ্বীনী পন্থায় সরলতা উপলব্ধি করতে পারবে।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কাউকে আদর্শ বানাতে চায়, সে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাবৃন্দকে নিজের আদর্শ বানায়। কারণ তাঁরা অন্তরের দিক থেকে এ উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলমে সবচেয়ে সুগভীর ও ‘তাকাল্লুফ’ (কষ্টকল্পনায়) অতি কম। তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়, যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নবীর সাহচর্যের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তোমরা তাঁদের অধিকার স্বীকার কর। কারণ তাঁরা ছিলেন সরল ও সৎপথের পথিক।’ *(রাযীন, মিশকাত ১৯৩নং, আল্লামা আলবানীর মতে এটি যয়ীফ, কিন্তু এর অর্থ সহীহ)*

পক্ষান্তরে শয়তানও দুই ছলনার মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্ট করায় সফলতা লাভ করেছে। প্রথমতঃ অতিরঞ্জন ও সীমালংঘন এবং দ্বিতীয়তঃ অবজ্ঞা, অবহেলা, বৈমুখ্য ও আলস্য। এই দুয়ের ছলনায় ফেঁসে একদল মনে করে যে, অতি নিচুদরের ফাসেক লোকের ঈমানও জিবরীল ও মিকাঈলের ঈমানের মত; আবু বাক্র, উমার তো দূরের কথা।

আর অন্য প্রকার ছলনায় পড়ে আর একদল মনে করে যে, কেউ একটি কাবীরা গুনাহ করলেই সে ইসলাম থেকে খারিজ! *(ইগাষাতুল লাহফান ১/১১৬)*

৬। কুফর সাধারণতঃ পাঁচ কারণে হয়ে থাকে।

(ক) অপলাপ করা বা প্রত্যয় না করা, সত্য শ্রবণ ক’রে তাতে বিশ্বাস না করা, যেমন জগতের স্রষ্টা আছেন, তা অবিশ্বাস করা, ফিরিশ্তা, কিতাব, (কুরআন), রসূল, কিয়ামতের পুনরুত্থান ও ভাগ্য ইত্যাদিকে অবিশ্বাস করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} (٦٨) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে মিথ্যা মনে করে, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? কাফেরদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নামে নয়? *(সূরা আনকাবূত ৬৮ আয়াত)*

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} (٣٢) سورة الزمر

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তার নিকট আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি? *(সূরা যুমার ৩২ আয়াত)*

(খ) জানা সত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করা, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা এবং সত্যকে জেনেও অস্বীকার করা, কোন স্বার্থ বা গদির লোভে অথবা নিজেকে জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ মনে ক’রে সত্যকে বরণ না করা। এ ধরনের কুফরী সর্বপ্রথম শয়তানই করেছিল। আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন,

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } (٣٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদারত হল ; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। আর সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।” *(সূরা বাক্বারাহ ৩৪ আয়াত)*

অনুরূপ কুফরী ফিরআউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا بِهَا

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} (١٤)

অর্থাৎ, অতএব যখন ওদের নিকট আমার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এল, তখন ওরা বলল, 'এ সুস্পষ্ট যাদু।' ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল; যদিও ওদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল? *(সূরা নাম্‌ল ১৩-১৪ আয়াত)*

(গ) সত্যে সন্দেহ পোষণ করা, পূর্ণ বিশ্বাস না রাখা, বিশ্বাসে 'কিন্তু' রাখা, কথায় 'নাকি' যোগ করা। যেমন আল্লাহ পাক এক বাগান-ওয়ালা প্রসঙ্গে বলেন,

{وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً (٣٥) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنقَلَباً (٣٦) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً} (٣٧)

অর্থাৎ, এভাবে নিজের প্রতি যুলম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল, সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এ কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে; আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন হই-ই, তবে আমি তো নিশ্চয়ই এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' তদুত্তরে (তার সঙ্গী) তাকে বলল, 'তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে?" *(সূরা কাহফ ৩৫-৩৭ আয়াত)*

যেমন বলা 'পুনর্জীবিত হতে হবে কিন্তু......., মৌলবীরা বলে, কবরে নাকি আযাব হবে, বলে তো বাপু, জান্নাত জাহান্নাম আছে।' ইত্যাদি।

(ঘ) বৈমুখ্য, স্পৃহাহীনতা, অবজ্ঞা ও অনীহা প্রকাশ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ} (٣) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, কিন্তু কাফেররা ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা

থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" *(সূরা আহক্বাফ ৩ আয়াত)*

অনুরূপ দ্বীন প্রসঙ্গে অবজ্ঞা ভরে বিমুখ হওয়া, কুরআন-হাদীস ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করা, 'ফকীরী বিদ্যা পড়ে কি হবে? ধুৎ এত কি মানতে পারা যায় নাকি? দূর! এসব পুরনো কথা, হুঁ যত সব শুনতে পার' ইত্যাদি বলা বা মনে করা।

(ঙ) মুনাফিকী বা কপটতা প্রকাশ করা, মুখে যা বলা হয় অন্তরে তার বিপরীত বিশ্বাস ও ধারণা করা। ধর্মে বিশ্বাসঘাতকতা করা, ইসলামের পরাজয়ে মনে আনন্দ লাভ করা এবং তার বিজয়ে মনে কষ্ট পাওয়া ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত আলোচনা গভীরভাবে পাঠ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কাফের হওয়া বা বলার মূলে রয়েছে মিথ্যাজ্ঞান। অর্থাৎ আল্লাহ বা নবী ﷺ-কে মিথ্যা জানা। মহানবী ﷺ-এর তবলীগ, তাঁর বাণী ও নির্দেশ প্রভৃতিকে মিথ্যাজ্ঞান করা বা অস্বীকার করা। সুতরাং কারো বিশ্বাস বা কর্মের মূলে এই মিথ্যাজ্ঞান না থাকলে, সে কাফের হয়ে যাবে না।

মহানবী ﷺ-এর পরবর্তী যুগে যদি কেউ তাঁর বাণী (হাদীস)কে অস্বীকার করে, তাহলে লক্ষণীয় যে, তাঁর ঐ বাণী সহীহ ও শুদ্ধভাবে প্রমাণিত কি না? অতএব যদি কোন ব্যক্তি শুদ্ধ প্রমাণিত, সর্বসম্মত, সর্ববিদিত হাদীস বা নববী বাণীকে অস্বীকার বা মিথ্যাজ্ঞান করে, তবেই তাকে কাফের বলা যাবে, নচেৎ না। যেমন যদি কেউ সহীহ বুখারীর কোন হাদীসকে মিথ্যা মনে করে অথবা তা নবী ﷺ-এর উক্তি নয় ভাবে, তাহলে আমরা বলতে পারি না যে, সে নবী ﷺ-কেও মিথ্যাজ্ঞান করে। যেহেতু সম্ভবতঃ সে তাঁর নিকট হতে বর্ণনাকারীকে মিথ্যাজ্ঞান করে অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করে এবং এর ফলেই আমরা তাকে 'কাফের' বলতে পারি না। (তাকে অন্য কিছু অবশ্য বলা যায়।)

অনুরূপভাবে যদি কেউ তাঁর উক্তির সত্যায়ন করে, কিন্তু তার অর্থে কোন সন্দেহ অথবা তার সম্ভাব্য কোন দূর তাৎপর্য করে, তাহলেও

আমরা তাকে 'কাফের' বলতে পারি না। তবে হ্যাঁ, যদি হাদীসের ঐ অর্থের উপর উম্মতের ইজমা (সর্ববাদিসম্মতি) থাকে এবং কোন সংশয় ও ভিন্ন ব্যাখ্যা অবশিষ্ট না থাকে, সে ক্ষেত্রে তাকে 'কাফের' বলা যাবে।

অতএব সর্ববাদিসম্মতিক্রমে সুস্পষ্ট শুদ্ধ প্রমাণিত এবং সর্ববাদিসম্মত একক অর্থবহ, নবী ﷺ-এর উদ্দিষ্ট অদ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিকে যে অস্বীকার করে, সে আসলে নবী ﷺ-কেই অস্বীকার করে এবং সে কাফের।

তদনুরূপ 'ইস্তিহলাল' অর্থাৎ কোন সর্ববাদিসম্মত হারাম জিনিসকে হালাল মনে করাতেও নবী ﷺ-এর মিথ্যায়ন হয় এবং মিথ্যায়নকারী কাফের হয়। অনুরূপ সর্ববাদিসম্মত হালাল বস্তুকে হারাম করাও।

সুতরাং মুসলিম যত বড়ই পাপী হোক, ফরয ত্যাগ করুক ও হারামে লিপ্ত হোক, তাতে সে কাফের হয়ে যাবে না। যেহেতু এসবগুলি পাপ ও অবাধ্যাচরণ, এ সবে মিথ্যায়ন হয় না এবং তাতে মানুষ কাফের হয় না, ফাসেক হয় এবং তার ফলে তাকে দোযখে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছ ক্ষমা ক'রে দেন।" *(সূরা নিসা ৪৮, ১১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى (١٤) لاَ يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى} (١٦)

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি (দোযখ) সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি ; যাতে সেই ব্যক্তি চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে, যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে মিথ্যায়ন করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়।" *(সূরা লাইল ১৪- ১৬ আয়াত)*

তদ্রূপ বিদআতীও কাফের হবে না; যদি না তার বিদআত দ্বীনের কোন অংশকে বা রসূল ﷺ-এর অনুরূপ উক্তিকে মিথ্যায়ন করে, যেমন

জাহমিয়াহ, মূর্জিয়াহ, মু'তাযিলা, রাফেযাহ, ক্বাদরিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ, মুআউবিলা (যারা আল্লাহর আয়াত, সিফাত ও রসূলের হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা ও সম্ভাব্য তাৎপর্য করে) প্রভৃতিদেরকে কাফের বলা যাবে না; যদি না তারা কোন আয়াত বা হাদীসকে অস্বীকার ও মিথ্যায়নের সাথে হঠকারিতা করে।

পক্ষান্তরে কিছু সলফ কতক মহাপাপী যেমন, বেনামাযী, জাহমী, যাদুকর প্রভৃতিকে কাফের বলেছেন, আমলসমূহকে মৌলিক ঈমানের মধ্যে পরিগণিত করেছেন এবং কুরআনেও বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ (জীবন-ব্যবস্থা) দ্বারা বিচার-মীমাংসা করে না, তারাই তো কাফের।" *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)* সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, মিথ্যায়ন না থাকলেও মানুষ কাফের হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে তা নয়। যেহেতু বেনামাযীর কাফের হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যেমন মতভেদ রয়েছে বেরোযাদার এবং যে যাকাত দেয় না তার কাফের হওয়ার বিষয়ে। যাঁরা বেনামাযীকে কাফের বলেন না, তাঁদের যুক্তি হল, যেহেতু সে কুরআন বা নবী ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করে না এবং নামায ত্যাগ করাকে হালাল মনে করে না তাই। পক্ষান্তরে যাঁরা তাকে কাফের বলেন, তাঁরাও বহু দলীল দিয়ে তা প্রমাণ করেন এবং এত বড় প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে বিনা ওজরে ত্যাগ করার দুঃসাহসিকতাকে এক প্রকার অবজ্ঞা ও অস্বীকারের অর্থে আরোপ করেন। যা এক ইজতিহাদী ব্যাপ্যার। যাঁদের মত সঠিক তাঁরা দু'টি এবং যাঁদের মত বেঠিক তাঁরা একটি নেকীর অধিকারী হবেন। সে বিষয়ে মুজতাহিদ ব্যতীত অন্যের জন্য মুখ খোলা বৈধ নয়।

পরন্তু যদি কোন বেনামাযী ফরয জানা সত্ত্বেও এই মনে করে নামায না পড়ে যে, নামায ফরয নয় বা নামায না পড়লেও চলে বা নামায একটা ফালতু জিনিস ইত্যাদি, তাহলে সে এই কথা দ্বারা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিকে মিথ্যা মনে করে এবং পর পরই নবী ﷺ-কেও মিথ্যাজ্ঞান করে; ফলে সে কাফের হয়ে যায়।

ব্যভিচার করলে কেউ কাফের হয় না। কোন মাহরামের সাথে ব্যভিচার করলেও কেউ কাফের হয় না। কিন্তু মাহারেম (অগম্যা) জানা সত্ত্বেও যদি কেউ কোন মাহরাম নারী (যেমন পিতার পরিত্যক্তা স্ত্রী অথবা স্ত্রী থাকতে শালী)কে প্রকাশ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে, তার সাথে সহবাস করে, তাহলে সে কাফের। কারণ এই কাজে সে কুরআনের আয়াতকে মিথ্যায়ন করে এবং হারামকে হালাল গণ্য করে।

কোন্ শ্রেণীর কাজে মানুষ কাফের হয়?

১। ঈমানের কোন রুক্ন; আল্লাহ, তাঁর কোন নাম বা গুণ, ফিরিশ্তা, অবতীর্ণ গ্রন্থ, পয়গম্বর, পরকাল ও বিচার দিবস অথবা তকদীর বা ভাগ্যকে যে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করবে সে কাফের।

২। যে ব্যক্তি সর্ববাদিসম্মত কোন ফরয (যেমন, নামায, রোযা, যাকাৎ, হজ্জ প্রভৃতি)কে অস্বীকার ও অমান্য করে এবং মনে করে যে তা ফরয নয় অথবা সর্ববাদিসম্মত কোন হারাম কাজ বা বস্তু (যেমন, ব্যভিচার, মদ, সূদ, হত্যা ইত্যাদি)কে কোন কাবীরা গুনাহর কাজকে হালাল বা বৈধ মনে করে, তবে সে কাফের। অনুরূপ কোন সর্ববাদিসম্মত কোন হালাল জিনিসকে যে হারাম মনে করে, সেও কাফের।

৩। যে ব্যক্তি শির্ক করে, আল্লাহ ছাড়া কোন ভিন্ন সৃষ্টির (ফিরিশ্তা, জিন, নবী, অলী, মাটি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির) ইবাদত করে, তাদের কাছে মুক্তি চায়, সাহায্য চায় অথবা আল্লাহ ও তার মাঝে কোন অসীলা উকিল বা মাধ্যম নির্বাচন ক'রে তার নিকট সুপারিশ চায়, সাহায্য চায় মুক্তি চায়, তাদের উপর ভরসা করে, তাদেরকে সিজদা করে, বিপদে স্মরণ করে ইত্যাদি, তাহলে সে কাফের।

৪। যে ব্যক্তি সর্বসম্মত কাফের বা মুশরিককে 'কাফের' ভাবে না অথবা তার কুফরীতে সন্দেহ করে অথবা তার ধর্মমতকে শুদ্ধ বা আল্লাহর

নিকট গৃহীত মনে করে অথবা অন্য কোন ধর্মকে ইসলামের সমতুল্য মনে করে, সে কাফের।

৫। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, নবী ﷺ-এর আদর্শ অপেক্ষা অন্যের আদর্শ উত্তম অথবা তাঁর সংবিধান অপেক্ষা অন্য কারো রচিত সংবিধান উত্তম অথবা মনে করে যে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দী ও তার পরে অচল অথবা তা মুসলিমদের অধঃপতনের কারণ অথবা তা প্রগতি-বিরোধী অথবা তা কেবল 'পার্শন্যাল ল' মাত্র, রাজনীতি বা অন্য নীতির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই অথবা ইসলামী আইন ও দণ্ডবিধি এ যুগের উপযুক্ত নয়, সে কাফের।

৬। যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর আনীত জীবন বব্যস্থার কোন অংশকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করে; যদিও বা সে তার দ্বারা আমল করে, তবুও সে কাফের।

৭। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন অংশ নিয়ে, আল্লাহ বা তাঁর রসূলকে নিয়ে, কুরআন ও তার বিষয় নিয়ে বা ধর্মপ্রাণ মুসলিমদেরকে নিয়ে (তাদের দাড়ি, পর্দা ইত্যাদি নিয়ে) ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, মজাক, ঠাট্টা বা উপহাস করে, সে কাফের।

৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল বা ফিরিশ্তাকে গালি দেবে, সে কাফের। অনুরূপ ইসলামের সম্মানীয় কোন জিনিসের অসম্মান করবে, যেমন কুরআন পদদলিত করবে বা নোংরাতে ফেলবে ইত্যাদি, সেও কাফের।

৯। যে ব্যক্তি যোগ, যাদু, বশীকরণ প্রভৃতি করবে, করাবে অথবা তাতে সম্মত ও সন্তুষ্ট হবে সে কাফের।

১০। যে ব্যক্তি বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করবে (অনেকের মতে) সে কাফের। যেহেতু নামায মু'মিনের ঈমান ও মুসলিমের ইসলামের নিদর্শন। যদিও এতে মিথ্যায়ন নেই তবুও এটি ব্যতিক্রম।

মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলাম ও শির্ক এবং কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্বাচনকারী হল এই নামায।" *(মুসলিম ৮২নং, মিশকাত ৫৬৯নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "আমাদের ও ওদের (কাফেরদের) মাঝে

চুক্তিই হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে (বা কুফরী করবে।)” *(তিরমিযী ২৬২১, ইবনে মাজাহ ১০৭৯নং)*

কোন আমল ত্যাগ করার ফলে কেউ কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু সাহাবাগণ নামায ত্যাগ করাকে কুফ্‌রী মনে করতেন। আব্দুল্লাহ বিন শাক্বীক্ব (রঃ) বলেন, ‘নবী ﷺ -এর সাহাবাবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী মনে করতেন না।’ *(তিরমিযী, মিশকাত ৫৭৯নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে, তার দ্বীনই নেই।” *(ইবনে আবী শাইবাহ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৫৭১নং)*

আবূ দারদা ﷺ বলেন, “যার নামায নেই, তার ঈমানই নেই।” *(ইবনে আব্দুল বার্র, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৭২নং)*

১১। যে ব্যক্তি মুসলিমের বিরুদ্ধে কোন মুশরিককে সাহায্য করে অথবা মুশরিকের সাথে অন্তরঙ্গতা করে, সে কাফের।

১২। যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, শরীয়তের বাইরে থেকেও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সামীপ্য লাভ হয় বা হকীকত কিংবা মারেফতে (?) পৌঁছে গেলে শরীয়তের বাধা আর থাকে না বা ধর্মীয় অনুশাসন তাকে আর মান্য করতে হয় না, সে কাফের।

১৩। যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা শিক্ষা ক’রে আমল করে না অথবা ধর্মীয় শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় মনে করে, সে কাফের।

‘কাফের’ ফতোয়া দেওয়ার শর্তাবলী

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা জামাআত বিশেষকে ‘কাফের’ ফতোয়া দেওয়ার পূর্বে তার মধ্যে কয়েকটি শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী। যেমন ঃ-

(ক) ঐ ব্যক্তি জানবে যে, ঐ কাজ করলে বা ঐ কথা বললে অথবা ধারণা করলে কাফের হতে হয় বা তা হারাম।

(খ) ঐ কাজ বা কথা সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে করবে বা বলবে এবং অত্যাধিক আনন্দ, সন্তাপ, ভয় ইত্যাদির ফলে মতিভ্রমবশে বা ভুলবশতঃ

করবে না বা বলবে না।

যেমন হাদীসে আছে, তওবার ফলে মহান আল্লাহ খুব খুশী হন। তার উদাহরণ বর্ণনা করে মহানবী ﷺ বলেন, এক মুসাফির তার উঁট সহ সফরে এক মারাত্মক মরুভূমিতে গিয়ে পড়লে বিশ্রামের জন্য এক গাছের নীচে ছায়ায় মাথা রেখে শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এরই মধ্যে তার উঁট গায়েব হয়ে গেল। উঁটের উপর ছিল তার খাবার ও পানীয় সব কিছু। কিছুক্ষণ পড়ে জেগে উঠে দেখল তার উঁট গায়েব। সে এদিক-সেদিক খোঁজাখুজি শুরু করল; কিন্তু বৃথায় হয়রান হল। ক্ষুধা ও পিপাসায় যখন খুব বেশী কাতর হয়ে পড়ল, তখন ফিরে সেই গাছের নিকটে এসে আবার শোওয়া মাত্র তার চোখ লেগে গেল। কিছু পরে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, তার সেই উঁট তার খাদ্য ও পানীয় সহ দাঁড়িয়ে আছে। তা দেখে সে এত খুশী হল যে, উঁটের লাগাম ধরে খুশীর উচ্ছ্বাসে ভুল বকে বলে উঠল, ‘আল্লাহ! তুই আমার বান্দা। আর আমি তোর রব!’ মহানবী ﷺ বলেন, (হারিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বান্দা ফিরে এলে) “তওবা করলে আল্লাহ ঐ হারিয়ে যাওয়া উঁট-ওয়ালা অপেক্ষা অধিক খুশী হন!” *(বুখারী, মুসলিম ২৭৪৭নং, প্রমুখ)*

(গ) ঐ কাজ করা বা ঐ কথা বলা কুফরী বা হারাম তার প্রমাণে ঐ ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট দলীল পেশ করা হবে এবং সে তা অমান্য ও অগ্রাহ্য করবে।

(ঘ) তা হারাম বা কুফরী নয় -এই ধরনের কোন ধারণা বা সন্দেহ ঐ ব্যক্তির নিকট থাকবে না অথবা পেশকৃত দলীলের কোন বৈধ তা’বীল বা সম্ভাব্য তাৎপর্য থাকবে না।

(ঙ) ঐ কাজ করা বা বলার উপর তাকে কেউ মজবুর বা বাধ্য করবে না।

সুতরাং মু’মিন যেরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ইসলামে প্রবেশ করে, অনুরূপ দৃঢ় প্রত্যয় ছাড়া ইসলাম থেকে বের হয়ে ‘কাফের’ হয়ে যাবে না।

যদি কেউ কোন বিশ্বাস, কর্ম বা উক্তিতে নেক নিয়তে নিজের ইজতিহাদ ক’রে ভুল করে, তবে (আক্বীদার বিষয় হলেও) তাকে ‘কাফের’ বলা যাবে না; যতক্ষণ না উপর্যুক্ত শর্তাবলী তার মধ্যে পূরণ

হবে। শর্তাবলী পূরণ হলে সে ব্যক্তি যদি অহমিকা, ঔদ্ধত্য বা স্বার্থবশে অথবা কোন ব্যক্তিত্বের অন্ধানুকরণ বশে ঐ ভুলের উপর অটল থাকে, তবে জানতে হবে যে, সে প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর পূজারী এবং সে ঐ ব্যক্তির দলভুক্ত হবে, যে ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেছেন,

{وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (١١٥) سورة النساء

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার নিকট (কিতাব ও সুন্নাহর অকাট্য দলীল দ্বারা) সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পরও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনীন (সাহাবা)গণের (বিশ্বাস ও কর্মের) পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে যে দিকে ফিরে যায় (নিজের জন্য যা পছন্দ করে) সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব (এবং তাকে লাঞ্ছিত করব ও মঙ্গলের উপর তাকে তওফীক দেব না। যেহেতু সে সত্য দেখে ও জেনে প্রত্যাখ্যান করে। তাই তার উপযুক্ত শাস্তি এই যে, সে ঐ ভ্রষ্টতায় ঘুরপাক খাবে এবং অধিক ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে) এবং (পরকালে) তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস। *(সূরা নিসা ১১৫ আয়াত)*

আর সে ব্যক্তি তাদের দলভুক্ত হবে, যাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٠٤)

অর্থাৎ, আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসূলের দিকে এসো', তখন তারা (বৈমুখ্য প্রকাশ করে এবং সে কথা গ্রহণ না ক'রে) বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'; যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না ও সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না (তবুও)। *(সূরা মাইদাহ ১০৪ আয়াত)*

আর যে ব্যক্তি মন মত চলে, হক ও সত্যানুসন্ধানে অবহেলা করে এবং বিনা ইলমে কথা বলে, সে ব্যক্তি পাপী ও অপরাধী। অতঃপর সে কাফেরও হতে পারে, কখনো তার অন্যান্য পুণ্যের পাল্লা ভারি হয়ে তা

ক্ষমার্হও হতে পারে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কাফের ও ফাসেক বলা ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেক বিদআতী, পাপী, মূর্খ বা পথভ্রষ্ট মাত্রই কাফের নয়। বরং ফাসেকও নয়; বরং পাপীও নয়। *(ফারাইদুল ফাওয়ায়েদ, ইবনে উষাইমীন ২৩০পৃঃ)* পূর্ণ বিচারের পরই তার মান নির্ণয় করা যাবে।

আরো কিছু সন্দেহের নিরসন

যারা জাহমী (আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করে) ও যারা বলে, 'কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি' তাদেরকে যাঁরা কাফের বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর সমূহ সিফাতকে অস্বীকার করা, কুরআনকে 'আল্লাহর সৃষ্টি' বলা কুফরী। যে এরূপ করবে বা বলবে নির্দিষ্টভাবে তাকে 'কাফের' বলা উদ্দেশ্য নয়। তাইতো ইমাম আহমাদ (রঃ) কুরআনকে 'আল্লাহর সৃষ্টি' বলার উপর কুফরীর ফতোয়া দিয়েছেন। ঐ কথা না বলার জন্য তৎকালীন খলীফার নিকট তিনি কত অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছেন। তবুও তিনি খলীফাকে নির্দিষ্টভাবে 'কাফের' বলে অভিহিত করেননি; বরং তাঁর জন্য দুআ করেছেন। যেহেতু তাঁর নিকট এ কথা স্পষ্ট ছিল না যে, খলীফা ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা এতে রসূল ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান করছেন বা তাঁর আনীত দ্বীনকে অস্বীকার করছেন। বরং তাঁরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেছেন এবং এ কথার প্রধান কথকের অন্ধানুকরণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ ঐ কুফরী থেকে উদ্দিষ্ট ছোট কুফরী, যার কারণে কেউ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না এবং দোযখে চিরস্থায়ী হয় না।

যারা আমলসমূহকে মূল ঈমানের মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কেউ আমল ত্যাগ করলে ঈমান হারিয়ে যাবে এবং কাফের হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমল ত্যাগ করলে ঈমানের পূর্ণতা নষ্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ সে পূর্ণ মু'মিন থাকবে না। অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও উচ্চারণ থাকার সাথে যার আমল থাকবে সে পূর্ণ মু'মিন। আমল না

থাকলে পূর্ণ মু'মিন নয় এবং তার আমল অনুযায়ী ঈমানে কমি-বেশি দেখা যাবে। এই অভিমতই কুরআন ও হাদীসের অনুকূল।

পক্ষান্তরে মুর্জিয়া ফির্কার মত উক্ত অভিমতের পরিপন্থী। তারা বলে, 'ঈমান কেবল বিশ্বাস ও প্রত্যয়ন করার নাম। যাবতীয় পাপ করলেও সে পূর্ণ মু'মিন। সকল মানুষের ঈমান সমান, জিবরীল, আবু বাক্র, উমার, হাজ্জাজ, পাপিষ্ঠ, আমি, আপনি সকল মুসলিমের ঈমান সমপরিমাণ। আমল ত্যাগ করলে বা পাপ করলে ঈমান কমে যায় না।'

ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী ফায়সালা না করলে কাফের হওয়ার অর্থ এই যে, ইসলামী শরীয়ত মত নিজের জীবন না গড়া, নিজের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান শরীয়ত থেকে গ্রহণ না করা। আর এ কথা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; রাজা-প্রজা ,আমীর-গরীর, চাষী-ব্যবসায়ী, বিচারপতি-অপরাধী সকলের জন্য এই নির্দেশ। আল্লাহর অবতীর্ণ সকল প্রকার আইন-কানুনকে মান্য করতে সকলেই আদিষ্ট। সুতরাং যে কেউ এ শরীয়ত অনুসারে বিশ্বাস করবে না, বলবে না এবং কর্ম করবে না, সে অবশ্যই কাফের।

দ্বিতীয়তঃ বলা যায় যে, আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী রাজ্যশাসন না করা ছোট কুফরী। যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। তবুও বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, যদি কোন বিচারপতি বা শাসক এই বিশ্বাস রাখে যে,

ইসলামী কানুন কোন কানুন নয়।

অথবা তা এ যুগে অচল।

অথবা তার চেয়ে মানব-রচিত আধুনিক আইন-কানুনই শ্রেষ্ঠ।

অথবা ইসলামী সংবিধানই মুসলিমদের পশ্চাৎ গমনের কারণ। ইত্যাদি, তাহলে সে কাফের। যেহেতু এতে সে শরীয়ত, কুরআন ও হাদীসকে মিথ্যায়ন করে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ এই বিশ্বাস রাখে যে, ইসলামী আইন ও সংবিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোন চাপে পড়ে তা বহাল করতে পারে না, তবে সে

কাফের নয়, ফাসেক ; যদি সে হারাম জেনে অন্য কানুন দ্বারা বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনা ক'রে থাকে। অন্যথা অনিসলামী সংবিধান দ্বারা বিচারাদি করা হালাল মনে করলে 'কাফের' বলে পরিগণিত হবে।

প্রকাশ থাকে যে, বিদেশ যাত্রার জন্য পাসপোর্ট-ভিসা, ট্রাফিক প্রভৃতির কানূন প্রণয়ন করা, যা শরীয়ত বিরোধী কানূন নয়; বরং তার নির্দেশ ও উদ্দেশ্যের অনুকূল, তা হারাম নয়।

যদি ইসলামী সংবিধানের বিপরীত কেউ কোন কানূন রচনা করে, তবে লক্ষণীয় যে, সে কানূন শরীয়তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত অথবা ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের? যদি তা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়, তাহলে পুনরায় লক্ষণীয় যে, সেই বৈপ্যরীত্য শরীয়ত অমান্য করার ফলে সৃষ্টি অথবা তাকে মিথ্যা ও অস্বীকার করার ফলে? সুতরাং যদি মিথ্যা ও অস্বীকার করার ফলে ঐ শরীয়ত বিরোধী কানূন কেউ পাস ক'রে থাকে, তবে তা কুফরী। অন্যথা প্রত্যেক মানব-রচিত নীতি ও কানূনকেই হারাম এবং তার প্রণেতাকে কাফের বলতে পারি না।

আবার কোন এমন কানূন যা শরীয়ত-বিরোধী নয়, তাকে শরীয়তের মর্যাদা দান করাও কুফরী। অতএব হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম ক'রে অথবা ইবাদতমূলক কোন আইন গড়ার অধিকার গায়রুল্লাহর হাতে দিয়ে আইন-কানূন তৈরী করাও কুফরী। যে বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন,

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢١) سورة الشورى

অর্থাৎ, এদের (মুশরিকদের) কি এমন কতকগুলি শরীক (উপাস্য) আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? *(সূরা শূরা ২১ আয়াত)*

মোটের উপর স্পষ্ট কথা এই যে, কোন মুসলিম রাষ্ট্রে যদি ইসলামী শরীয়ত ও সংবিধান প্রবর্তন না করা হয় এবং সে দেশের শাসকগোষ্ঠী

এমন মানব-রচিত আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা ক'রে থাকে, যা শরীয়তের সংবিধান-বিরোধী ও ইসলাম-পরিপন্থী নয়, শরীয়তের সংবিধানকে তারা শ্রেষ্ঠ মানে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যা মানে না, ফিরিশ্তা, কিতাবসমূহ, রসূলসমূহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, নামায পড়ে, যাকাত দেয়, রোযা রাখে, হজ্জ করে এবং এ সবে কাউকে বাধাও দেয় না, কিন্তু মদ্যপায়ী, চোর, ব্যভিচারী, খুনী প্রভৃতিকে ইসলামী দন্ডে দন্ডিত করে না, তবে এই সংবিধান প্রচলন না করাটা বা নানান ফাসেকী ও ফাজেরী (যেমন, পতিতালয়, সূদী ব্যাংক, গান-বাদ্য প্রভৃতি) তাদেরকে 'কাফের' বলার জন্য দলীল করা জায়েয নয়। যতক্ষণ না তারা এ সবকে হালাল মনে করে বলে জানা গেছে এবং তাদেরকে তা জানানো হয়েছে। যেমন, পূর্বোক্ত কাফের ফতোয়ার শর্তাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে এই কথা বলতে চাই যে, জোশ, আবেগ ও উত্তেজনায় পড়ে কাউকে 'কাফের' বলা বড় বিপজ্জনক ও সর্বনাশী ব্যাপার। যাতে মুসলিমকে সাবধানতা ও সংযমশীলতা অবলম্বন করা ওয়াজেব। কাউকে 'কাফের' ফতোয়া দেওয়ায় সাবধানতা অবলম্বন মুত্তাক্বীদের নীতি এবং মু'মিনদের পথ। সুতরাং যদি কারো নিকট এ কথা সার্বিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, অমুক মুসলিম সর্ববাদিসম্মত কোন হারাম বস্তু বা কর্ম হালাল মনে করে, তবে তখন সাবধানতা ও অধিক উত্তম এই যে, সে ঐ মুসলিমের উক্তি অথবা কর্ম প্রভৃতিকে কুফরী বলবে এবং নির্দিষ্টভাবে ঐ ব্যক্তিকে (অনুরূপ কোন জামাআত বিশেষকে) 'কাফের' বলবে না এবং তাকে 'কাফের' বলতে জনগণকে আহবান করবে না। যেহেতু ---

১। মুসলিম কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে এটাই স্থির সিদ্ধান্ত যে, সে ব্যক্তি মুসলিম। এই মৌলিক অবস্থা হতে তাকে বহির্গত ও খারিজ করতে অনুরূপ দ্ব্যর্থহীন ও দ্বিধাহীন কোন স্থির-নিশ্চিত (কাফেরকারী) দলীল হতে হবে।

২। কাফের প্রতিপাদক ব্যক্তির দলীল ইত্যাদিতে ভুল-ভ্রান্তি এবং অবধারণে ভ্রম ও চ্যুতি হতে পারে, যা থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়।

৩। কোন মুসলিমকে কাফের জানায় ভুল করা কোন কাফেরকে মুসলিম জানা অপেক্ষা গুরুতর বিপজ্জনক। যেহেতু কোন মুসলিমকে কাফের জানায় ভুল করা মানুষের অধিকারে ভুল এবং মানুষের অধিকারে ভুল পারস্পরিক কলহ ও মার্জনার উপর নির্ভর। পক্ষান্তরে কোন কাফেরকে মুসলিম জানায় ভুল, আল্লাহর অধিকারে ভুল এবং আল্লাহর অধিকারে ভুল মার্জনীয়।

৪। সম্ভবতঃ কাফের প্রতিপাদিত ব্যক্তি সীমাহীন ক্রোধ অথবা নিরতিশয় খুশির অবস্থায় কুফরী ব'লে বা ক'রে ফেলেছে। যেমন খুশির আতিশয্যে একজন আল্লাহকে ব'লে ফেলেছিল "তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু!" যা ধর্তব্য নয়। (যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।)

৫। সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তি ঐ কর্ম বা কথা যে কুফরী, তা জানে না।

৬। সম্ভবতঃ ঐ ব্যক্তি কারো চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে অথবা প্রাণের ভয়ে বা অন্য কিছুর ভয়ে ঐ কুফরীর কাজ বা কথা ক'রে বা ব'লে ফেলেছে। যা সাধারণতঃ দুর্বল ঈমানের মানুষের নিকট ঘটে থাকে। যাতে তার আপত্তি ও ওজর গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١٠٦)

অর্থাৎ, কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল। *(সূরা নাহল ১০৬ আয়াত)*

পরন্তু একজনের নিকট এই সমস্ত দ্বিধা ও সন্দেহের নিরসন হলে এটা জরুরী নয় যে, সকলের নিকট হতেই তা নিরসন হবে। অতএব এ ক্ষেত্রে কেবল ঐ কর্ম বা কথাকেই কুফরী বলে জানা সাবধনতা ও সংযমশীলতার

পরিচয় এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষকে 'কাফের' প্রতিপাদিত ক'রে তার বিরুদ্ধে জন-বিক্ষোভ সৃষ্টি না করা দূরদর্শিতা ও পারদর্শিতার নিদর্শন। আর এ ধরনের বিষয় ঐ ধরনের সর্ববাদিসম্মত স্পষ্ট কুফরী বিষয়ের অনুরূপ নয় যে, যাতে বলা হবে, যে কাফেরকে কাফের মনে করে না, সে কাফের। *(ইহকামুত তাক্বরীর, লিআহকামি মাসআলাতিত তাকফীর, মুরাদ শুক্রী)*

কাফেরের বিধান

শরয়ী প্রমাণ দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে যখন কোন মানুষ কাফের হয়ে যাবে, তখন তার উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দন্ডবিধি কার্যকরী হবে ঃ-

১। যে বিষয়ের অলী (অভিভাবকত্বে) ইসলাম শর্ত, সে বিষয়ে সে অলী হতে পারবে না। তার তত্ত্বাবধানে কোন নারীর বিবাহ হতে পারে না।

২। মক্কা শরীফ ও তার হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

৩। তার যবেহকৃত পশুর মাংস হালাল হবে না। (অথচ আহলে কিতাবদের যবেহকৃত পশুর মাংস হালাল।)

৪। কোন মুসলিম নারীর সাথে তার বিবাহ বৈধ হবে না এবং বিবাহ হয়ে থাকলে সে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে অথবা মুসলিম স্ত্রীর তার সংসর্গে থাকা হারাম হবে।

৫। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তান মুসলিম (স্বামী বা স্ত্রী)র হবে।

৬। মৃত্যুর সময় ফিরিশ্তাগণ তার মুখমন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তার প্রাণ হরণ করবে এবং তিরস্কারের সাথে দোযখাগ্নির দুঃসংবাদ দেবে।

৭। তার জন্য জানাযার নামায, রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করা হারাম হবে।

৮। মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে না।

৯। সে কোন মুসলিম আত্মীয়র ওয়ারেস হবে না এবং তার মৃত্যুর পর

মুসলিম পরিজনরা তার ওয়ারেস হবে না।

১০। কাফের ও মুশরিক দলের সাথে তার হাশর হবে।

১১। এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হবে।

বাকী থাকল দুনিয়ার শাস্তি। সেটি ইসলামী সরকার প্রয়োগ করবে, কোন ব্যক্তি বা জামাআত নয়। সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সে শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার কোন ব্যক্তি বা জামাআতের হাতে নেই। আর তার নাম জিহাদও নয়।

هذا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.